১৯৫ যুদ্ধাপরাধী বনাম আটকে পড়া বাঙালি

জাফর ওয়াজেদ

প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির একটি রোগ। তাই ৫০ বছর আগে যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করা দূরে থাক, উপরন্তু বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা হয়নি বলে সে দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে গ্লানিময় কণ্ঠে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ কখনো পরাভব মানেনি। তাই স্বদেশি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চার দশক পর হলেও অব্যাহত রেখেছে। এবার পাকিস্তানি সেই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রতীকী হলেও শুরু করতে যাচ্ছে। বিশ্ব জনমত আজ হোক, কাল হোক, এদের বিচারের জন্য পাকিস্তানকে চাপ দেবেই।

স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও প্রশ্ন ওঠে এখনো কেন ১৯৫ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার হলো না। বিচার ছাড়াই তাদের কেন পাকিস্তানিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। কেন পাকিস্তান প্রতিশ্রুতি দিয়েও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পদক্ষেপ নেয়নি। আটকে পড়া বাঙালিরা পাকিস্তান থেকে ফেরত এলেও বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিরা এখনো কেন পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করছে না। প্রশ্ন যখন আছে, উত্তরও তার রয়েছে দণ্ডায়মান। কেন, কী কারণে যুদ্ধবন্দিরা মুক্তি পেল, এর নেপথ্যে ঘটনার ঘনঘটা কম নয়।

পঞ্চাশ বছর আগে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার সেনাদের আত্মসমর্পণ পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত এই তিন দেশের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক টানাপোড়েন শুরু হয়। যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানি সেনাদের বিচার নিয়ে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান পরস্পরবিরোধী অবস্থান নেয়। ভারত এক্ষেত্রে বাংলাদেশকেই সমর্থন করে। কিন্তু ভারতের তখন তাদের আশ্রিত প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির ভরণপোষণ নিয়ে হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। বাংলাদেশও আটকে পড়া পাকিস্তানিদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কারণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের পক্ষে তাদের ভরণপোষণও অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদিও এরা তখন থেকেই জেনেভা কনভেনশনের অধীনে। যেমন ছিল পাকিস্তানি পরাজিত সেনারা। ভারত যেহেতু আন্তর্জাতিক জেনেভা কনভেনশনের সদস্য এবং যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী, তাই যুদ্ধবন্দিদের রক্ষা করার জন্য দেশটি আন্তর্জাতিকভাবে দায়বদ্ধ। যে কারণে পাকিস্তানি হানাদাররা বাঙালি মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণে আগ্রহী হয়নি। হলে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদা পেত না। যদিও যৌথ বা মিত্রবাহিনীর কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু দলিলে মিত্রবাহিনীর বাঙালি পক্ষের স্বাক্ষর নেই। তবে বাংলাদেশি পাকিস্তানি সেনাদের আত্মসমর্পণের জন্য যে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তাতে যৌথ বাহিনীর কথা উল্লেখ ছিল। আত্মসমর্পণ দলিলেও বলা হয়, 'আত্মসমর্পণকারী সেনাদের জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করা হবে এবং আত্মসমর্পণকারী সব পাকিস্তানি সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে'। এতে হানাদারদের স্থানীয় সহযোগী রাজাকার, আলশামস ও আলবদররা জেনেভা কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এদের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের হাতে ন্যস্ত বলে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছিলেন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ভারতে স্থানান্তর কালে।

যুদ্ধবন্দিদের যাতে বিচার হতে না পারে, সেজন্য পাকিস্তান তখন 'তুরুপের তাস' হিসেবে সে দেশে আটকে পড়া ৪ লাখ বাঙালিকে জিম্মি করার হুমকি দেয়। যুদ্ধবন্দিদের দ্রুত পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর জন্য জাতিসংঘসহ মুসলিম দেশগুলো ভারত ও বাংলাদেশকে চাপ দিতে থাকে। একাত্তরের সশস্ত্র যুদ্ধ শেষে তখন শুরু হয় তিন দেশের মধ্যে কূটনৈতিক লড়াই এবং তাতে বিশ্বের অন্য দেশগুলোও জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশই প্রথম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটাকে সামনে নিয়ে আসে। মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একেএম কামরুজ্জামান ১৯৭১-এর ২৭ ডিসেম্বরে ঘোষণা দেন যে, 'বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ৩০ জন শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি সরকারি কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেছে এবং গণহত্যায় সহযোগিতার জন্য অচিরেই তাদের বিচার হবে'। এর পরই একাত্তরে গণহত্যার শিকার সাত বাংলাদেশি কর্মকর্তার পরিবারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের নিকট দোষী পাকিস্তানিদের বিচারে বাংলাদেশকে সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়ে কলকাতায় সংবাদ সম্মেলন করা হয়। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য ডিপি ধর বলেন, 'ভারত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন পরীক্ষা করছে। সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে'। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই ভারত স্পষ্ট ঘোষণা দেয় যে, 'যুদ্ধাপরাধী বিচারের ব্যাপারটি বাংলাদেশের এখতিয়ারের ভেতর। কারণ, পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করেছে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের কাছে। ফলে এ নিয়ে ভারতের একার বলার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নেই। যা কিছু করতে হয় তা বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার ভিত্তিতেই করতে হবে'। বাংলাদেশ সরকারও ঘোষণা দেয় যে, কূটনৈতিক স্বীকৃতির আগে এবং সম্পর্কের সমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা বলতে প্রস্তুত নয়। আর ১৯৭১-এর ২০ ডিসেম্বরে ক্ষমতায় বসে ভুট্টো দেখলেন, তার ক্ষমতা ধরে রাখা সহজ নয়। 'জাতশত্রু' ভারতের কাছে হেরে এবং আত্মসমর্পণ করে পাকিস্তানের তখন করুণ দশা। ভুট্টো জাতিসংঘে দাবি তোলে ভারতে আশ্রিত তার ৯৩ হাজার সেনাকে পাকিস্তানে দ্রুত ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ তখন গোঁ ধরে বসে আছে; যুদ্ধাপরাধের জন্য তারা পাকিস্তানি সেনাদের বিচার করবে। সে উদ্দেশ্যে যুদ্ধাপরাধী সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যদের এক তালিকাও বাংলাদেশ তৈরি করে।

ভুট্টোর জন্য তখন প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল সে বিচার ঠেকানো এবং যুদ্ধাপরাধীসহ সব বন্দিকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া। ভুট্টোর জন্য এই এজেন্ডা পাকিস্তানি জেনারেলরা ঠিক করে দেয় ক্ষমতায় বসার প্রথম দিন থেকেই। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্ন সেসময় ছিল পাকিস্তানের বিবেচনার বাইরে বরং যেসব দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাদের সঙ্গে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখবে না বলে পাকিস্তান ঘোষণা দেয়। তাই দেখা যায়, ১৯৭২-এর প্রথমদিকে ছোটো ছোটো গোটা কয়েক দেশের সঙ্গে পাকিস্তান তার সম্পর্ক ছেদও করে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করায় যুক্তরাজ্যের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তান কমনওয়েলথ থেকেও বেরিয়ে আসে।

বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে। সে অনুযায়ী বিচারের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার বাহাত্তরের ২৯ মার্চ ঘোষণা করে যে, জেনারেল নিয়াজি, রাও ফরমান আলীসহ ১১০০ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হবে। সেজন্য একটি প্রস্তাবনাও উপস্থাপন করা হয়। যাতে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীর বিচারে দেশি-বিদেশি জুরি নিয়োগ এবং অন্যদের জন্য শুধু দেশীয় জুরি নিয়োগের উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভারত সেসব পাকিস্তানি সেনাকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়, যাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিকভাবে প্রমাণের ভিত্তিতে 'প্রাইমা ফেসিইকেল' যোগ করতে পারবে। বাংলাদেশের সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ১৪ জুন ভারত সরকার প্রাথমিকভাবে নিয়াজিসহ ১৫০ যুদ্ধবন্দিকে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরে রাজি হয়। ১৯৭২ সালের ১৯ জুন বঙ্গবন্ধু পুনরায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলার মাটিতেই তাদের বিচার হবে'।

পাকিস্তান আটকে পড়া পাকিস্তানিদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের জন্য যে কমিটি করেছে, তারা বছরসাতেক আগে সুপ্রিমকোর্টে বলেছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৪ থেকে ৫ লাখ পাকিস্তানি আটকে পড়ে আছে। পাকিস্তান এদের ফেরত এবং দায়দায়িত্ব নেবে না। বাংলাদেশকেই এদের দায়দায়িত্ব বহন করতে হবে। বাংলাদেশ অবশ্য বলে দিয়েছে, একাত্তর-পূর্ব সময়ে জন্মগ্রহণকারী পাকিস্তানিদের ফেরত নিতে হবে।

১৯৯২ সালের ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গোলাম আযমের বিচার সম্পর্কে বিতর্ক হয়। বিএনপির মন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, রফিকুল ইসলাম মিয়াসহ বিএনপি সরকার পক্ষের কতিপয় সদস্য বঙ্গবন্ধু সরকারের সময় রাজাকার ও পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা প্রদর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তাদের স্মরণ করিয়ে দেন, 'যেসব রাজাকারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ছিল, তাদের ক্ষমা করা হয়নি'। ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকে কেন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা সংসদে আরও বলেন, পাকিস্তানে আটকে পড়া ৪ লাখ বাঙালিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই সরকারকে বাধ্য হয়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল'। শেখ হাসিনা এমনও বলেন, 'সেনাপতি নূরউদ্দিন খান, বিডিআর প্রধান আবদুল লতিফ, জেনারেল সালাম, মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, মাজেদুল হকসহ ৪ লাখ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় ছিল, তাদের পরিবার-পরিজনদের মাতমে সাড়া দিয়েই বঙ্গবন্ধু সেদিন যুদ্ধাপরাধী ও পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি সেনাদের ছেড়ে দিয়ে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে এনেছিলেন। (সংবাদ, ১৬ এপ্রিল ১৯৯১)।

পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিরা শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে পেরেছিল। তেমনি ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দিও পাকিস্তান ফিরেছিল বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু বিহারিদের আর বিনিময় হয়নি। দিল্লিচুক্তি রক্ষা করে পাকিস্তান ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকে বিচার করেনি যেমন, তেমনই বিহারিদের ফেরত নিচ্ছে না। বিশ্ব জনমতই পারে এ সমস্যার সমাধান করতে।

#

লেখক- মহাপরিচালক, পিআইবি

পিআইডি ফিচার